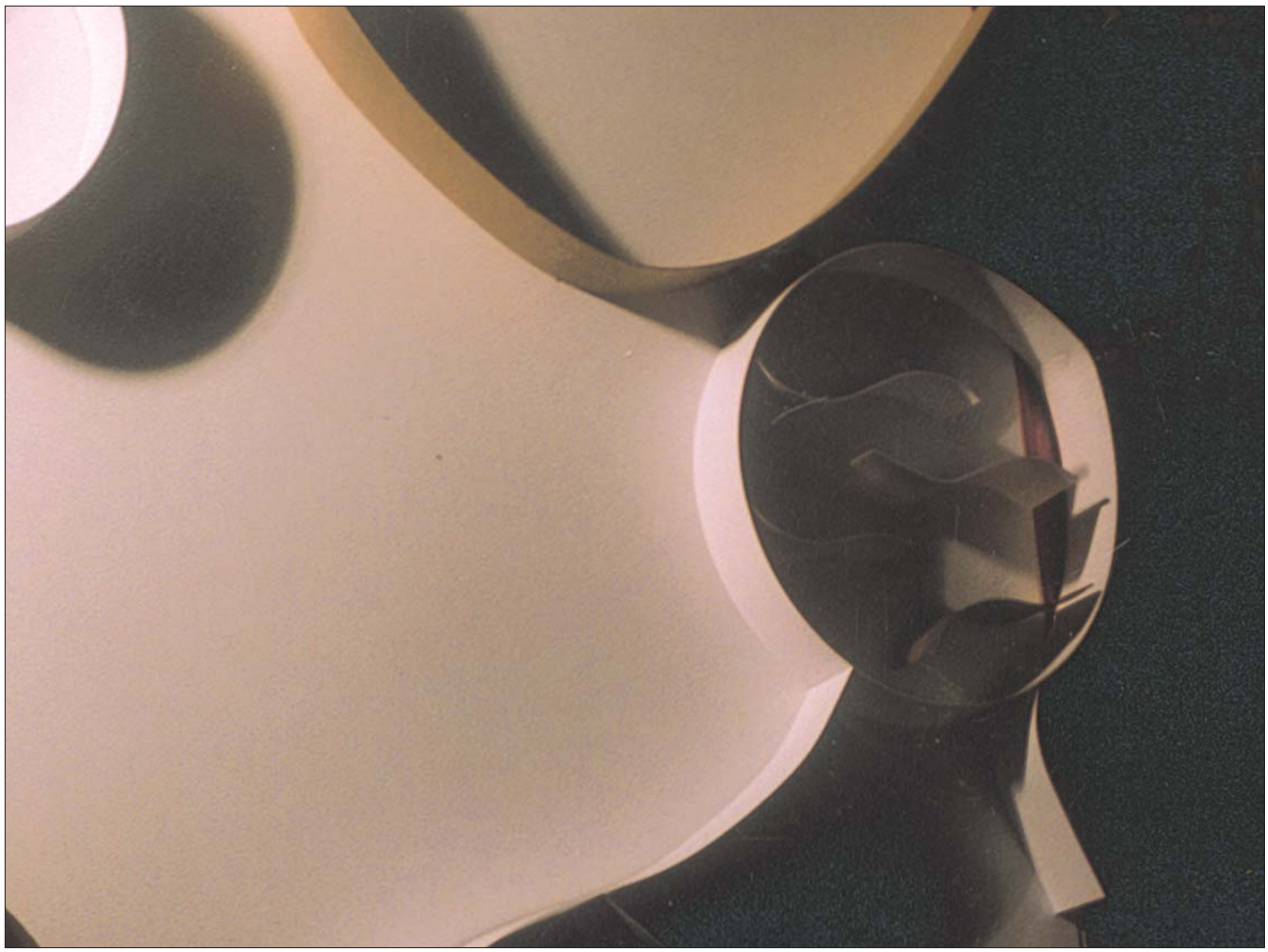

উপন্যাস

আবু তালিবের সরল প্রশ্ন

মঈনুল আহসান সাবের

আমার ইচ্ছাটা একটু অন্যরকম। আপনাকে ফোনে আমি বলেছিলাম শুধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব। এখনও ঠিক ওরকমই ইচ্ছা আমার। তবে সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ, রাজনীতি, এখনকার মানুষ...।

দেখো, সব মিলিয়ে দেশের অবস্থাটা এখন এমন, এত করুণ, আমার কিছুই বলতে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া এসব বিষয়ে বলার জন্য আরো লোক আছেন। পত্রিকার পাতা উল্টোলে, রেডিও-টেলিভিশনের নব ঘোরালে তুমি তাদের কথা পাবে। অত্যন্ত মূল্যবান সব কথা। নিজ নিজ পক্ষে তারা অত্যন্ত সোচ্চার।

আপনার ভেতর একটা ক্ষোভ লক্ষ করছি।

আমি নিজেকে সুস্থ মানুষ বলে মনে করি। সুস্থ মানুষের কিছু ক্ষোভ সবসময়ই থাকে, এ সময় তো

থাকবেই। তুমি কি মনে করো, কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এখন আনন্দিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে হাসি মুখে বসে থাকা সম্ভব? পত্রিকার পাতা পর পর তিনদিন উল্টোলে যে কোনো মানুষের আধা পাগল... আমি বলতে চাচ্ছি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কথা।

আমরা পাগল, মানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছি না কেন?

আমাদের সহ্য ক্ষমতা এতোটাই বেড়ে গেছে যে আমরা বোধ শূন্য হয়ে পড়েছি। আমরা অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়াহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আছে, সাময়িক একটা ক্ষোভ বা প্রতিবাদ আছে, তারপরই সবকিছু আবার সেই আগের মতো। এটা অত্যন্ত খারাপ একটা ব্যাপার- প্রতিক্রিয়াহীনে পরিণত হওয়া- এটা আশঙ্কার কথা। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে প্রতিক্রিয়াহীনে পরিণত হয়, মুষ্টিমেয় কজন শুধু নিজ নিজ নাশকতা ও অন্যায়ে ও স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে, সে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা আমরা বলতে পারি না। এখন, এই যে ধরো... ধরো জঙ্গিবাদের উত্থান, এ নিয়ে কথা হচ্ছে অনেক, কিন্তু প্রকৃত কোনো উদ্বেগ কি তুমি লক্ষ্য করছ? একটা বোমা ফাটল, কয়েকজন মারা গেলেন, আধাঘণ্টাও লাগবে না, তার আগেই দেখা গেল সেই রাস্তায় মানুষজন আড্ডা মারছে। অবশ্য এই ভোঁতা হয়েছে মানুষ, এটা এক বা দুদিনের ব্যাপার না, দীর্ঘ এক পরিকল্পিত পত্রিকার মধ্য দিয়ে মানুষকে এই পর্যায়ে আনা হয়েছে। দেশের মানুষ সাড়া দেবে না। অংশ নেবে না এটা কোনো কোনো মহলের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

কাদের কথা বলছেন আপনি? পরিকল্পিত পরিকল্পনার পেছনেই বা কারা আছে বলে আপনার ধারণা?

সরকার আছে, যখন যে সরকার থাকে সেই সরকার বিভিন্ন সময় আবার বিরোধী দলের উদ্ভট কথায় মানুষ বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ হয়, সেই থেকে এক পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াহীনতা তৈরি হয়। তুমি যদি আঞ্চলিক-বাণিজ্য বা ক্ষমতার ভারসাম্যর আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দিকটি দেখতে যাও, তবে যাদের জন্য বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল রাখাটা জরুরি, যারা বার্গেনিং পরিস্থিতি করতে চায়- তারা আছে এই পরিকল্পনার পেছনে।

আরেকটু খুলে বলবেন...?

না, আমি আরেকটু খুলে বলব না। যারা লেখা পড়বেন, তারা এই ব্যাপারগুলো জানেন। আমজনতা তো এই লেখা পড়বেন না। সুতরাং বেদানা ভেঙে দানা তাদের মুখে তুলে দেবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

হ্যাঁ, সব মিলিয়ে অবস্থাটা খারাপ। এ অবস্থায় লেখকদের দায়িত্ব...।

তুমি হুট করে আবার লেখক বা লেখালেখির মধ্যে চলে এলে কেন? তুমি বলেছিলে সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে।

না, আমি ঠিক ওরকম বলিনি। আমি বলেছিলাম সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তবে সাহিত্য নিয়ে হবে মূল আলোচনা। এখন সাহিত্য আর সমাজ একসঙ্গে এসে গেল। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এ অবস্থায় লেখকরা কী করতে পারেন?

তোমার প্রশ্নটার সঙ্গে এমন একটা বিষয় জড়িয়ে আছে, যেটা আমি ঠিক পছন্দ করি না। বিষয়টা হচ্ছে- লেখকের দায়িত্ব। লেখকের সামাজিক দায়িত্বটা কী, এ নিয়ে বহুদিন ধরে বহু বলাবলি হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। তুমি কিংবা কেউ ধরে- বেঁধে লেখকের কাঁধে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারবে না। তবে আমি মনে করি লেখকেরও কিছু করার আছে। ধরো, এই যে সময়, এ সময়টাকে আমি ধরে রাখলাম আমার লেখায়, এটাও কিন্তু এক ধরনের দায়িত্ব পালন। অবস্থা বদলানোর দায়িত্ব কিন্তু লেখকের নয়, লেখকের দায়িত্ব অবস্থাটা তুলে ধরা। অবস্থাটা লেখক নানাভাবে তুলে ধরতে পারেন- প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, প্রতীকীভাবে বা রূপকের মাধ্যমে। আমি শুধু দেখব কতটা শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরা হল। বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি গল্প-উপন্যাস বা কবিতা, প্রবন্ধ যা-ই লিখি না কেন সেটাকে প্রথমে গল্প-উপন্যাস কবিতাই হতে হবে। ... অ্যাকটিভিস্ট লেখকদের কথা উঠতে পারে। তবে অ্যাকটিভিস্ট লেখকের সংখ্যা খুবই কম। তাদের দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।

এখনকার অবস্থা নিয়ে আপনি কি কিছু লিখছেন?

যদি বলি এখনকার অবস্থা নিয়ে লিখছি, মিথ্যা বলা হবে। কারণ এখনকার অবস্থা তুলে ধরার জন্য বিশাল ক্যানভাস। কিন্তু আমি লিখতে বসেছি গল্প। একটা গল্পে এখনকার পুরো অবস্থা তুলে ধরার ক্ষমতা শুধু আমার না, সম্ভবত কারো নেই। আমরা যা পারি বিভিন্ন গল্পে এখনকার অবস্থার বিভিন্ন দিক আলাদা আলাদা করে তুলে ধরতে। আমি যে- গল্পে হাত দিয়েছি, সেখানে এ রকম এক ব্যাপার আছে। গল্পটা এ সময়েরই গল্প।

কী সেটা?

এক স্বল্প শিক্ষিত, কৃষিজীবী মুক্তিযোদ্ধার গল্প। সে বিপদে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিপদে পড়ার ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়। সেই স্বাধীনতার পর থেকে এটা হয়ে আসছে। তবে তাই বলে তো, তাদের বিপদে পড়া নিয়ে গল্প লেখা বন্ধ থাকে না। আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিপদে-পড়া বয়স্ক ও ধীরস্থির এক মুক্তিযোদ্ধার বিপদে পড়ার গল্প লিখতে শুরু করেছি। তবে সত্যি কথা কী- শুরুটাই হচ্ছে না।

আপনি কি গল্পের শুরু এবং শেষ প্রথমেই ঠিক করে নেন?

গল্পের শুরুটা সবসময় যে পাকাপোক্তভাবে ঠিক করে নিতে হবে, তা নয়। কিছু কিছু গল্প আছে, বক্তব্য বা বিষয়ের কারণে তার শুরুটা হয় পরিকল্পিত। লেখক ভেবেচিন্তে একটা ইঙ্গিত দিয়েই হয়তো আরম্ভ করেন। গল্পের প্রথম লাইনটিই হয়তো নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। আমার ক্ষেত্রে এমনটি খুব কমই হয়। তুমি যদি আমার কিছু গল্প পড়ে থাকো, তবে খেয়াল করবে আমি আরম্ভ করি খুব ক্যাজুয়ালি। তবে এই আরম্ভ করাটাই অধিকাংশ সময়ে আমাকে খুব ভোগায়। ক্যাজুয়ালি আরম্ভ করলেও আরম্ভটা যেন আকর্ষণীয় হয়, এটার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। আর গল্পের শেষটা কিন্তু আমি প্রথমেই ঠিক করে নেই। যারা আমার পাঠক, তারা জানেন আমার সব গল্পই সুর্নিদিষ্টভাবে শেষ অভিমুখী। কেউ কেউ বলেন শেষ অংশটুকুই আমার গল্প। তারা ভুল বলেন না। তবে এমন হয়, শেষটা যেভাবে আমি ভেবে নেই, লিখতে লিখতে তার কিছুটা বদলে যায়, সেটা অবশ্য তেমন কিছু না।

আচ্ছা, এই যে আপনি শুরু ও শেষ ঠিক করে নিয়ে গল্প লিখছেন, এতে কি আপনার গল্প বেশ কিছুটা ধরা-বাঁধা হয়ে যাচ্ছে না?

তাই কি? আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। গল্প নামে যে-জিনিসটা আমরা লিখি, সেটা কেন লিখি? পাঠককে একটা গল্প পড়াব বলে, তাই না? তা, পাঠককে যদি গল্পই দেব আমি, শুরু আর শেষটা ঠিক করে নেব না? লিখতে-লিখতে এক সময় আপনা-আপনি আমি শেষের কাছে চলে যাব, না ভাই আমি এমনটা বিশ্বাস করি না। গল্পহীন গল্পেও আমার বিশ্বাস নেই।

অর্থাৎ, আপনি বলছেন, গল্পে অবশ্যই গল্প থাকতে হবে?

ওটার নামই তো গল্প, তাই না? তুমি তো একটা গল্প লিখতেই বসেছ। এমন একটা বিশ্বখ্যাত গল্প দেখানো যাবে না যেখানে গল্প নেই।

আমাদের পত্রিকায় আপনার একটা গল্প দেয়ার কথা। সে গল্পটা কি সাম্প্রতিক সময়ের ওপর লেখা হবে? মানে যেটা আপনি লিখতে আরম্ভ করেছেন...।

আমি বলেছি এখনকার অবস্থাটা নিয়ে আমার লেখার খুব ইচ্ছা। চারপাশে এত বিষয়, এত ঘটনা- একজন গল্প লেখকের জন্য এটা হচ্ছে দারুণ এক সময়। সে যদি চারপাশের বিষয়গুলো সাজিয়ে নিতে পারে তার ভেতরে, দারুণ কিছু গল্প সে লিখে যেতে পারবে।

আপনিও তা হলে বেশ কিছু গল্প এ সময় লিখে ফেলবেন?

হয়েছে কী, আমি তোমাদের গল্পটা আরম্ভ করেছি, সেটা বললাম। কিন্তু গল্পটা আমার ভেতর সমস্যা তৈরি করেছে।

আপনি কি একটু বিস্তারিত বলবেন?

ঐ গল্পটা নিয়ে আমি এগোতে পারছি না। আমি প্রতিদিনই ওটা নিয়ে টেবিলে বসছি, ভাবছি- কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন গল্পটা এগোচ্ছে না।... তোমাকে বলেছি আমার ইচ্ছা ছিল আমাদের এই এখনকার অবস্থাটাই

আমি গল্পে তুলে ধরব। আমি সেভাবেই বিষয় বেছে নিয়েছিলাম। তারপর পুরো ব্যাপারটা সাজিয়েও নিয়েছি আমার ভেতরে। কিন্তু সমস্যাটা যে কোথায় হচ্ছে!

এরকম কি এই প্রথম হল আপনার, না আগেও হয়েছে?

না না, এ রকম হয়। এ রকম সব লেখকেরই হয়। আমারও আগে হয়েছে। হয়তো খুব গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসলাম। লিখেও ফেললাম পৃষ্ঠা খানেক। কিন্তু তারপর দেখলাম আর এগোতে পারছি না। নানা কারণে এ রকম হতে পারে। লেখক হয়তো মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিংবা কিছুটা লিখে তার হয়তো মনে হল, তিনি বিষয়টা নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন, সেভাবে গল্প এগোচ্ছে না। হয়তো বিষয় অনুযায়ী উপস্থাপন হচ্ছে না। দেখো, একটা কথা আছে- নাথিং ইজ নিউ আন্ডার দি সান। সে হিসাবে কোনো গল্পও নতুন না। গল্প নতুন হয়ে ওঠে তার উপস্থাপনের কৌশলে। আমার মনে হচ্ছে এই গল্পে আমার যে উপস্থাপন কৌশল তা পাল্টানো দরকার।

কী করবেন? পাল্টাবেন?

মাঝে মাঝে হয় কী- আলসেমি লাগে। তখন, গল্পের বিষয়টা জরুরি- এ রকম যতই মনে হোক না কেন, স্রেফ মাথায় বাড়তি বোঝা নিতে ইচ্ছা করে না বলে গল্পটা লেখা হয় না, পড়ে থাকে। এটা সাময়িক হতে পারে। হয়তো কিছুদিন পরই নতুনভাবে গল্পটা আমি শুরু করতে পারি। আবার অনেক সময় সেটা হয় না। গল্পটা আর লেখাই হয় না। পড়ে থাকতে-থাকতে ওটার অপমৃত্যু ঘটে। আমিও হয়তো ভুলে যাব গল্পটার কথা। তবে আমার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয়- গল্পটা থেকেই যায় আমার মাথার ভেতরে। মাঝে- মাঝে উঁকি মারে। আর আমিও তখন ঐ গল্পটা নিয়ে ভাবি। ভাবতে- ভাবতে গল্পটা উপস্থাপনের অন্য কৌশল হয়তো আমি পেয়ে যাই। তখন ওটা নতুনভাবে তৈরি হবে। তোমাদের জন্য যে গল্পটা লিখছি, সেটা এগোচ্ছে না। কিছু সময় দরকার, অবশ্যই আমার কিছু সময় দরকার।

আমাদের বিশেষ সংখ্যার জন্য লিখছেন গল্পটা। এখন গল্পটা অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে দেবেন?

আগেই বলেছি- লিখতে গিয়ে যে গল্প হঠাৎ জট পাকিয়ে যায়, সেই গল্পই আবার হয়তো অবলীলায় খুলে যায়। তবে গল্পটা আমি ফেলে রাখব না। আমি ওটার পেছনে আরো কিছু সময় ব্যয় করতে চাই। আমার ধারণা ঠিকমতো লিখতে পারলে ওটা বেশ ভালো একটা গল্প হবে।

আচ্ছা, এই যে আপনি গল্পটা শুরু করে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেছেন, আপনি বললেন এরকম হতেই পারে; এর পাশাপাশি এ রকমও কি হয় না- গল্পটা একভাবে শুরু করে কিছুটা এগিয়ে আপনি দেখলেন গল্পটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে!

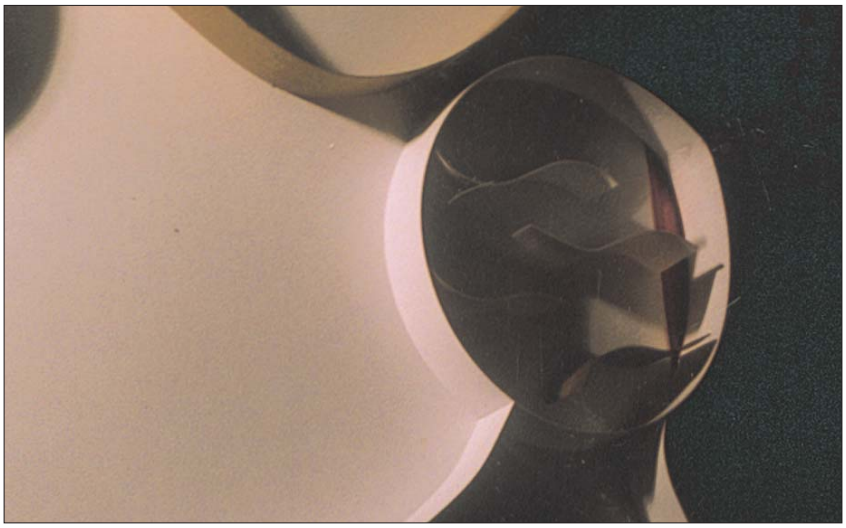

এ রকম হয়। পুরো ব্যাপারটা পরপর সাজিয়ে শেষের দিকে ধাবিত হওয়ার পরও এ রকম হয়। হয় কী- কিছুদূর এগিয়ে গল্প হঠাৎ ঘুরে যায়, লেখকের হয়তো তখন এ রকম মনে হয়- এভাবে ঘুরে গেলেই গল্পটা অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কিংবা গল্পের ভেতরে যে পরিবেশ তখন তৈরি হয়েছে, সে পরিবেশই গল্পকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। গল্পের নিজস্ব একটা প্রাণ আছে। আমার অনেক সময়ই মনে হয় কিছু- কিছু ক্ষেত্রে লেখার এক পর্যায়ে এসে গল্প নিজের মতো আচরণ করে, নিজেই তার পথ তৈরি করে নেয়। লেখকের কাজ হচ্ছে ওই গল্পকে সুষ্ঠুভাবে শেষের দিকে নিয়ে যাওয়া।

মাঝখানে এসে গল্প মোচড় দিলে শেষটা কি বদলে যেতে পারে না? যেমন, গল্পের শেষ তো আপনি আগেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, মাঝপথে এসে গল্প ঘুরে গেল, তখন কী শেষটাও ঘুরে যাবে না?

না, সবক্ষেত্রেই যে শেষটা ঘুরে যাবে, এমন নয়। ধরা যাক, গল্পের শেষ হচ্ছে একটা গন্তব্য। তা, মানুষ তো তার গন্তব্যে নানাভাবে পৌঁছাতে পারে, তাই না? লেখকও তেমন। একজন গল্পকার একটা গল্প লিখতে বসল। এগোতে এগোতে তার মনে হল যে পথে সে এগোচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে সে যদি পাশে আরেকটা পথ কেটে নেয়, তবে তার এগুনো আরও সংহত হয় এবং সে তার গন্তব্যে আরও সহজে পৌঁছাতে পারে, তখন অন্য পথ ধরে সে এগোতেই পারে। তবে পাশাপাশি এটাও ঠিক, অনেক সময় গল্পের শেষটাও বদলে যায়? ওই যে বললাম না- গল্পের আছে নিজস্ব প্রাণ, ওই প্রাণ কখনো গল্পের নিয়তি বদলে দিতে পারে। লেখকই যে সবসময় নির্ধারক তা তো নয়। তা ছাড়া লিখতে- লিখতেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও কি বদলায় না? হ্যাঁ, তাৎক্ষণিকভাবেও বদলায়।

আপনি যে-গল্পটা লিখতে আরম্ভ করে এখন এগোতে পারছেন না বলে থেমে আছেন, সে গল্পটা সম্পর্কে কিছু বলুন?

কী বলব? গল্পটা আমার মাথায় আছে এলোমেলো, নিজেই ওটাকে আমি সাজাতে পারছি না, এখন আমি তোমাকে কী বলব?

তবু, কিছু শুনি আপনার মুখ থেকে। আপনি বললেন গ্রামের, মানে কৃষিজীবী এক মুক্তিযোদ্ধার বিপদে পড়ার গল্প এটা। কী বিপদ?

বিপদ হচ্ছে এই রকম যে সে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটা স্বীকৃতি, মানে পুরস্কার পেয়েছে।

৭১-এ তার বীরত্বের জন্য?

নাহ্, সেটা এখন ঘটবে না। তার বিপদ অন্য রকম। তাছাড়া আমার এই মুক্তিযোদ্ধা, যার নাম আবু তালিব রেখেছি, সে ৭১-এ বীরত্বের জন্য কোনো স্বীকৃতি বা পুরস্কার চায় না। সে মনে করে ও সময় স্বাধীনতার যুদ্ধ করার দরকার ছিল, সে করেছে, ব্যস। অবশ্য সে স্বীকৃতি চায় না, তবু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এসে হাজির রাজনৈতিক কারণে, এটাও তার বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। এ নিয়ে গল্প হতে পারে। এই দেখো, তোমার সঙ্গে গল্প করতে- করতে আমি নতুন এক গল্পের বিষয় পেয়ে গেলাম। এ রকম আরও কিছু গল্প পেলে, তুমি জানো আমার সিরিজ গল্পের প্রতি ঝোঁক আছে, আমি একই বিষয়ভিত্তিক কয়েকটা গল্প লিখে ফেলতে পারব।... এ অবশ্য পরের কথা। যা বলছিলাম, আমার আবু তালিবের বিড়ম্বনা অন্য ধরনের।

কী ধরনের?

ধরা যাক, সে ছিল অতি দরিদ্র, অতি স্বল্প শিক্ষিত একজন। ৭১-এ ধরো তার বয়স ২৩-২৪। তখনো তেমন কিছুই সে করে না, অন্যকে কৃষিকাজে সহায়তা করা ছাড়া। বিয়ে করেনি। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের শুরু। ... এখানে একটা কথা বোধহয় বলা দরকার। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জন্য অতি বিরাট এক বিষয়। তবে এও ঠিক, এখানেও কিছু রঙ চড়িয়েছি আমরা। অনেকেই এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছেন- দেশ মাতৃকার ডাকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, এ রকম অবশ্যই হয়েছে। আবার অনেকে যুদ্ধে জড়িয়েছে বাধ্য হয়ে- এও সত্যি। আবু তালিব

এই দুই দলের এক দলেও পড়ে না। সে কিছুটা হয়তো পরিস্থিতিগত কারণে যুদ্ধে জড়ায়। তবে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশতে- মিশতে পুরো ব্যাপারটা নতুন করে অনুধাবন করে এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে।

সে কি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিল?

সে বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সে জানত সে কেন, কিসের জন্য যুদ্ধ করছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে সে অতি দরিদ্র ও স্বল্পশিক্ষিত। ফলে যুদ্ধ শেষে সে বিশাল এক স্বপ্ন নিয়ে ফিরে এল, ক্রমান্বয়ে হতাশ হল। সে একটা পরিবর্তন আশা করেছিল। পরিবর্তন দেখলও সে, তবে তা নিজের পক্ষে না। সে দেখল সে আসলে কিছুতেই নেই। ক্রমশ নিজের অবস্থান নিয়েই সে সন্দিহান হয়ে উঠল। এবং এক সময় রাজাকারদের উত্থানও তাকে দেখতে হল।

আপনি মনে হচ্ছে সেই প্রথম থেকে শুরু করেছেন। কিন্তু এর জন্য অনেক জায়গা দরকার। ছোট গল্পে কি আপনি এতসব আনতে পারবেন?

কে বলেছে আমি অতসব আনব। আমি ওসবের কিছুই আনব না।

তা হলে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি আবু তালিবের পটভূমি এভাবে তৈরি করেছি। ধরো একটা চরিত্র তৈরি করছি। সে চরিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ড গল্পে হয়তো আসবে না, কিন্তু আমার ভেতর তার একটা কাঠামো থাকতে হবে। এ রকম না হলে চরিত্রটি সম্পর্কে আমারই সম্যক ধারণা থাকবে না। হয়তো দেখা যাবে যে কথা তার বলার না, সে কথাই সে বলছে, যে আচরণ তার সঙ্গে মানানসই না, সে আচরণই সে করছে।

এবার বুঝতে পারছি। চরিত্রকে যৌক্তিক রাখা। এখন গল্পটা সম্পর্কে কিছু কি বলবেন?

প্রথমেই বলেছি, এটা এক মুক্তিযোদ্ধার বিপদে পড়ার গল্প। কী বিপদ? সে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি বা পুরস্কার পেয়েছে। সরকার নিয়মমাফিক তাকে জানিয়েছে কবে তাকে এবং আরো কয়েকজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাকে বলা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। এটাই হচ্ছে তার জন্য বিপদ।

কেন এটা তার জন্য বিপদ?

সে ছিল দরিদ্র এবং স্বল্পশিক্ষিত। স্বাধীনতার পর গ্রামে ফিরে সে দেখল, তার কিছুই করার নেই। যুদ্ধের সময় নানা কথা শুনেছে সে- এই বদলে যাবে- ঐ বদলে যাবে। কিন্তু সে দেখল, তার পক্ষে কিছুই বদলায়নি। সে আগের অবস্থায়ই আছে। এমন নয় যে, সে কিছু পাওয়ার আশায় মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। আসলে সে রকম কোনো চিন্তায়ই তার মাথায় ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের সময়, বললাম না নানা কথা শুনেছে সে। একটা প্রত্যাশা তার ভেতর তৈরি হয়েছিল। প্রত্যাশা পূরণ হল না, তবে এর ক্ষীণ এক রেশ তার ভেতর থেকে গেল। কিংবা এমনও হতে পারে সেটা তার ভেতরে ছিলই প্রথম থেকে, যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা সেটা উসকে দিল। সে কিছু করতে চাইল, পারল না। একজন স্বল্পশিক্ষিত কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নই বলা উচিত, আর দরিদ্র লোকের পক্ষে ইচ্ছা করলেই কিছু একটা করে ফেলা সম্ভব না।

কিন্তু কিছু তো সে করল। নইলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কেন জুটবে?

ধরা যাক, কৃষিক্ষেত্রে সে ব্যাপক সফলতা পেল। সে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আশাতীত ভালো করতে আরম্ভ করল। এক সময় নিজেও কিছু জমির মালিক হল। সেখানে আরো বেশি সফল হল সে। সে হয়তো একটা পুকুর লিজ নিল। মাছ চাষ করে গ্রামের সবাইকে চমকে দিল। পাশাপাশি সে সমবায় সমিতি গড়ে তুলল। তার সমবায় সমিতি রোল মডেলে পরিণত হল। এসব এক-দু'দিনে হল না, ধীরে ধীরে হল। এক সময় দেখা গেল সে সফল কৃষক, সফল সমবায়ী, তার নাম সবাই জানে, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও। পুরস্কারটা সে কারণেই তাকে দেয়া হবে। আমি গল্পটা এভাবে আরম্ভ করেছি। তুমি একটু শোনো-

'এই পুরস্কর আমি তো লিবার চাই না বাজান।'

এই কথা আবু তালিব বলল। তার কণ্ঠে কোনো আবেগ কিংবা ক্রোধের উপস্থিতি নেই। সে এমনভাবে বলল, যেন সে শুধু একটা তথ্য উপস্থাপন করল মাত্র।

তার পুরস্কারপ্রাপ্তির খবর নিয়ে এসেছে পাশের বাড়ির মজনু। সে মফস্বলের কলেজে পড়ে, এখন কলেজ ছুটিতে বাড়িতে। সকালে সে গঞ্জে গিয়েছিল, খবরটা সে সেখানে পেয়েছে। এ রকম একটা খবর আগে ভাগে তার পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু খবরটা জেলা পরিষদ অফিসে এসে পৌঁছেছে। তারা আলোচনা করছে এই পাশের গ্রামেরই একজন এ রকম একটা পুরস্কার পেয়েছে। এ খবর আনুষ্ঠানিকভাবে আজই, কিংবা দেরি হলে কাল পৌঁছাবেই আবু তালিবের কাছে। কিন্তু খবরটা জানতে পেরেছে মজনু, তার আর ত্বর সইল না। সে বাতাসের চাকা পায়ে লাগিয়ে গ্রামে ফিরে এল।

আবু তালিবকে বাসায় খুঁজল সে। বাসায় আবু তালিব নেই। সে কোথায় থাকতে পারে, এটা অনুমান করতে মজনুর সময় লাগল না। সে আবু তালিবের কিংবা নিজের বাসায় কাউকে এই খবরটা দিল না। এই খবর আবু তালিবের আগে কাউকে সে দিতে পারে না। সে আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

হ্যাঁ, আবু তালিব জায়গাতোই আছে। দূর থেকে তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি মজনুর খুব সুন্দর লাগল। সামনে বিশাল ফসলের ক্ষেত। যেতে যেতে বহুদূর চলে গেছে। আবু তালিব সেই ফসলের ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মজনু তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে আন্দাজ করতে পারছে আবু তালিব কতটা মুগ্ধ চোখে ফসলের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আছে।

আবু তালিবের দু'চোখে সবসময় এক অদ্ভুত মায়া। খুব কঠিন কোনো কাজের সময়ও সেই মায়া থেকে যায়। আর এই মায়া দিয়েই সম্ভবত সে সবাইকে বেঁধেছে। তাকেও যেমন। কিন্তু শুধু কি তাই? একটা মানুষ এ বয়সেও এতোটা উদ্যোগী আর কর্মঠ হয় কী করে? কত সময় দেখা যায়, কাজ করতে করতে তারা হাঁপিয়ে গেছে, কিন্তু আবু তালিবের কিছুই হয়নি। বরং উল্টো হাসিমুখে তাদের বলেছে 'হাঁপায়া গেছ বাজান? এইটুকুতে হাঁপাইলে চলিচ্ছে?'

মজনু আবু তালিবের কাছে পৌঁছানোর আগেই দূর থেকে ডাকতে আরম্ভ করল ও চাচমিয়া, চাচমিয়া।

আবু তালিব একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মজনু তার পাশে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল। আবু তালিব তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল- 'তর চোখত-মুখত কুনো বিপদের কতা নাই। তুই এ্যাঙ্কা করি ছুটা আসলু কিসক?'

'চাচমিয়া, খবর শুনিছেন?'

'কী খবর শুনবার কতা কচ্ছিস?'

মজনু মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে বলল- 'পুরস্কার, পুরস্কার। এই পুরস্কারের কতা আপনি শুনেন নাই?'

আমি আরো কিছুটা লিখেছি, তবে সবটা তো আর পড়ে শোনানো সম্ভব না। এই এটুকুই তোমাকে শোনালাম। আমার মনে হচ্ছে আরম্ভটা একেবারেই হয়নি।

কেন? আমি এগুলো বুঝি না, তাই জানতে চাচ্ছি।

গাঁথুনিটা একেবারেই হয়নি। ল্যাঙ্গুয়েজও দাঁড়ায়নি। নতুন করে আরম্ভ করতে হবে।

কিন্তু একটা রহস্য তো আছে। মানে কী পুরস্কার...তারপর কী হবে? সে হয়তো কিছুটা আছে। কিন্তু ভাষাগত দুর্বলতার জন্য সে রহস্য হয়ে উঠবে না। তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে, অন্যভাবে আরম্ভ করা দরকার। কী যেন এখানে নেই, কী যেন অনুপস্থিত।

সেটা নতুন করে লিখলেই আপনি ঠিক করে ফেলতে পারবেন। আর আপনি বলেছেন এ গল্পটি আপনি ফেলে রাখবেন না, আপনি লিখেই যাবেন। তা হলে-

আর সমস্যা থাকছে কোথায়? বিশেষ সংখ্যায় লেখাটা আমরা পাচ্ছি।

হয়তো পাচ্ছ। কিন্তু সমস্যা আছে। গল্পটা আমি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব, বুঝতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে এই পথে যাই, আবার মনে হচ্ছে ঐ পথে।

এখন যে পথে আছেন, সে পথেই যদি থাকেন, কী হবে?

সে পথেও গল্পটা শেষ হবে। এতদিন ধরে গল্প লিখছি, যেকোনো পথেই একটা গল্প আমি শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু একটা অস্বস্তি কাজ করছে আমার ভেতর।

আসলে আমি ঠিক ধরতে পারছি না। কারণ গল্পের মাত্র সূচনাতে আছি আমরা। মূল বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।

প্রথমেই বলেছি এটা এক মুক্তিযোদ্ধার হেরে

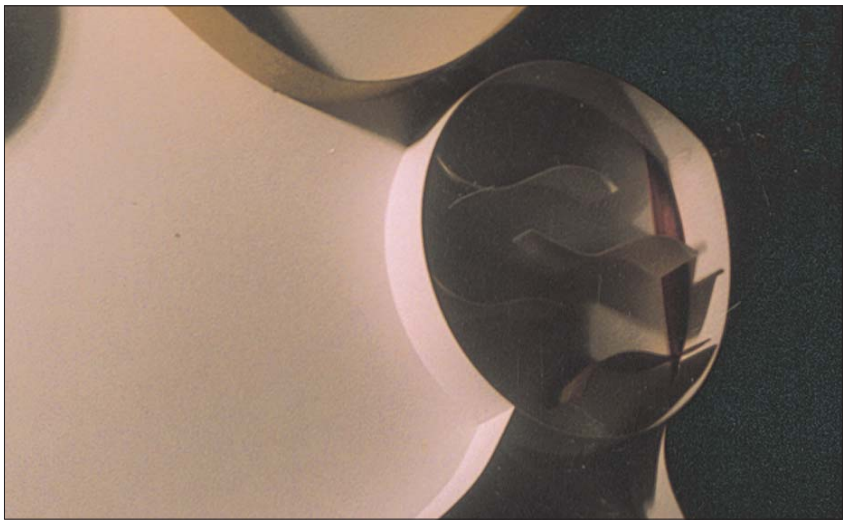

যাওয়ার গল্প।

তা বলেছেন। ওটুকুই বলেছেন।

একজন মুক্তিযোদ্ধার হেরে যাওয়ার গল্প তাই না? তা কোন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা সে? সে এক সফল মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের মাঠে সে সফল। তার বীরত্বের কাহিনী তার সহযোদ্ধারা জানে। যদিও বীরত্বের জন্য আরও অনেকের মতো সে কোনো খেতাব পায়নি। তবে এ নিয়ে তার কোনো খেদ নেই। এ কথা তার মাথায় আসেনি কখনো। তবে প্রাথমিক অবস্থায় স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তার। সে তার আশার বিপরীতে পরিবর্তন দেখেছে। সে রাজাকারদের উত্থান ও আস্ফালন দেখেছে। অর্থাৎ সফলতার পর ব্যর্থতার একটি চিত্র। তারপর আবার সে সফল। কীভাবে? তোমাকে আগে বলেছি- এক সময় কৃষি ও খামারের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে। সফল কৃষক হয় সে, সফল খামারি, সফল মৎস্যচাষী এবং সফল সমবায়ী। তার গরিব অবস্থা অবশ্যই দূর হয়। সে গ্রামের বহু দরিদ্র মানুষ ও বেকার যুবককে তার সমিতির নিচে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তার শিক্ষা অল্প, কিন্তু বুদ্ধি সহজাত। সাফল্য তাকে আরো হিসেবি, পরিশ্রমী ও শাণিত করে তোলে। আর কোনো দিকে তাকায় না সে। তার পুরো সময় সে ব্যয় করে তার কৃষিক্ষেত্র, মৎস্যপুকুর ও সমবায় সমিতির পেছনে। এভাবে সে নিজেকে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কৃষক কিংবা সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। দেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। নানা সময়ে নানা ঘটনা তাকে প্রচন্ডভাবে ব্যথিত করেছে। '৭১-এর পরাজিত শত্রুদের আস্ফালন তাকে মর্মাহত করেছে। কিন্তু সে বুঝেছে- এখন মর্মাহত হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার নেই। এখন সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য হেঁটে হেঁটে কোথাও পৌঁছাতে পারবে না। এই উপলব্ধি তাকে আরো কৃষি ও সমবায়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে ওসবে আরো নিমগ্ন হয়েছে। এবং এক সময় তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এই এখানেই তার জন্য এক বিড়ম্বনার জন্ম।

এই যে আপনি বলছেন, এখানেই গল্পের রহস্য আপনি টিকিয়ে রাখছেন। আমি নই, পাঠকও বুঝতে পারছে না কেন একটি রাষ্ট্রীয় ইতিবাচক স্বীকৃতি বিড়ম্বনার কারণ হবে?

সেটা এই এখনই আমি তোমাকে বলে দিতে পারি না।

না না, আমি সেটা জানতেও চাচ্ছি না। আপনি বলেছেন গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। কিন্তু একটা পরিকল্পনা নিশ্চয় আপনার আছে। মানে, না পারেন এগিয়ে নিতে, কিছু একটা নিশ্চয় ভেবেছেন- কীভাবে আসবেন সে সম্পর্কে।

তা ভেবেছি। নানা রকম ভেবেছি। কিন্তু একটাও আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি একেকভাবে এগোবার কথা ভাবছি আর আমার মনে হচ্ছে না না, এভাবে না। শুধু গল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়, গল্পের সমাপ্তি কীভাবে হবে, সেটা নিয়ে আমি দ্বিধায় আছি। ...ঠিক দ্বিধা বলা উচিত হবে না। একটা কিছু তো আমি বলতে চাই, কিন্তু সেটা আমি কীভাবে বলব, বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, আমরা ধরে নেই আপনি যে পর্যন্ত লিখেছেন, তার পর থেকে আবার লিখতে শুরু করেছেন। কী রকম হবে সেটা?

এর পরেরটুকু জটিল কিছু নয়। এ রকম হতে পারে-

'মজনু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল আবু তালিবের দিকে- চাচামিয়া, কী কচ্ছেন?

হামি কি কচ্ছি, তুই শুনিছ। শুনিস নাই?'

সেই জন্যই জিজ্ঞাচ্ছি। কী কচ্ছেন এসব!

যা কচ্ছি ঠিকই কচ্ছি।

এই পুরস্কার আপনি লিবেন না?

এই পুরস্কার হামি লিমু না।

কিসক?

আবু তালিব চুপ করে থাকল।

আপনা কবার লাগবি এই পুরস্কার আপনি কিসক লিবেন না।

বাজান, এই পুরস্কার হামি কিসক লিমু না, এ্যটা তোমার বুঝা নিবার হবি।

হাসি কিছুই বুঝবার পারিচ্ছি না। সরকার আপনাকে এত বড় একখান পুরস্কার দিবি, হামরা কত আনন্দ ফুর্তি করমো, আর আপনি কচ্ছেন...।

মজনুর কথা শুনে আবু তালিবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। হাসিটা অবশ্য স্থায়ী হল না। পর মুহূর্তেই সেটা মুছে গেল এবং আবু তালিব চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফসলের ক্ষেতের দিকে তাকাল, বলল- পুরস্কার আমি লিবার পারি না বাজান। হামি শুনেছি... হামি শুনেছি যে...।'

এই এভাবে এ গল্পকে বোধ হয় টেনে নেয়া যায়।

কিন্তু কী শুনেছে আবু তালিব?

সেটা যদি এই এখনই আমি তোমাকে বলে ফেলি, কোনো রহস্য থাকল? ব্যাপর হচ্ছে সে এমন কিছু শুনেছে, যার জন্য সে ঐ পুরস্কার নেবে না বলে ঠিক করেছে।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু গল্প নিশ্চয় এখানেই থেমে যাচ্ছে না। গল্প তো এগোবে। কী কারণে আবু তালিব পুরস্কার নিতে রাজি নয়, সেটা না হয় আপনি এখন আমাকে না-ই বললেন, ঠিকই বলেছেন- তা হলে গল্পের আমেজটাই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু গল্প কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, সেটা নিশ্চয় বলতে পারেন।

আবু তালিব বিপদে পড়বে। সে যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে, এটা বিপদ না, বিপদের কারণ হচ্ছে- সে পুরস্কারটা নেবে না। গ্রাম, আশপাশের গ্রামের গঞ্জের, পাশের মফস্বল শহরের সবাই জেনে যাবে আবু তালিব শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রায় সবাই প্রায় বলছি এ কারণে যে কেউ কেউ মূল স্রোতের বাইরে থেকেই আনন্দ পায়, যাই হোক- প্রায় সবাই এ খবরে খুবই খুশি হল। অনেকেই ছুটে এল আবু তালিবের বাড়িতে। অভিনন্দন জানাল। মিষ্টি এল, ফুলের মালা এল। অনেকেই জানাল পুরস্কার নিয়ে আবু তালিব ফিরে এলে তাকে বিশাল এক সংবর্ধনা দেয়া হবে। কারণ আবু তালিব এ অঞ্চলের গর্ব, কারণ আবু তালিব তাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু আবু তালিব বলল পুরস্কার সে নেবে না।

সে তো জানিই। তারপর? আপনি বিপদের কথা বললেন...।

আবু তালিব পুরস্কার পেয়েছে, এটা ছড়াল বাতাসের বেগে। আর সে যে পুরস্কার নেবে না, এটাও ছড়াল বাতাসের বেগে। তবে দ্বিতীয় বাতাসটা দমকা। এই দমকা বাতাস অনেককেই এলোমেলো করে দিল। যারা তাকে ভালোবাসে, মজনুর মতো আরো অনেকেই আছে, তারা অবাক হয়ে গেল, কষ্ট পেল। তারা বার বার জিজ্ঞেস করল কেন আবু তালিব এত বড় সম্মান প্রত্যাখ্যান করবে। আবু তালিব তাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিল না। এর আগে মজনুকেও কিন্তু উত্তর সে দেয়নি। উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। যারা বুঝল না, তারা

আবু তালিবকে বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল। তারা বারবার বলল- এই পুরস্কার অবশ্যই নেয়া উচিত। কিন্তু আবু তালিবের এক কথা। তবে এও সে বলল, এক সময় অবশ্যই সে জানাবে কেন এই পুরস্কার সে নিতে চায় না।

কেন? এখন কি বলা যাবে, না এখনও না?

ওদিকে আরেকটি না, আরেকটি না, বেশ কয়েকটি দল তৈরি হল। আবু তালিব যে পুরস্কার পেয়েছে, এতে তারাও খুশি। তবে সে যে পুরস্কার নিতে রাজি নয়, খবরে তারা মর্মাহত নয়, তারা ক্ষুব্ধ।

তারা চাচ্ছে আবু তালিব এই স্বীকৃতি অবশ্যই গ্রহণ করুক?

দেখো, চাচ্ছে তো সবাই। যারা মর্মাহত তারা চাচ্ছে, যারা ক্ষুব্ধ তারা চাচ্ছে। তবে এই চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। একপক্ষ আবু তালিবকে বোঝানোর চেষ্টা করছে- যেন সে এই স্বীকৃতি গ্রহণে অসম্মত না হয়। আরেক পক্ষ এই কাজটি করতে চাচ্ছে বলপূর্বক। অর্থাৎ তারা আবু তালিবকে বাধ্য করতে চাচ্ছে।

এটা কি আবু তালিবের প্রতি তাদের ভালোবাসা থেকে?

তাদের কেউ কেউ আবু তালিবকে পছন্দ করত। পছন্দ করার কারণ আছে। তবে যখন তারা জানল আবু তালিব এই পুরস্কার নিতে রাজি নয়, তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তারা পর্যায়ক্রমে এসে হাজির হল আবু তালিবের বাসায়, কিংবা তার সঙ্গে কথা বলল ফসলের ক্ষেতে, তার সমবায় সমিতির অফিসে, কিংবা মাছ ভর্তি কোনো পুকুরের পাশে। এ পর্যায়ের কিছুটা আমি এভাবে লিখতে পারি-

'আবু তালিব গভীর মমতায় তাকিয়েছিল পুকুরটার দিকে। তাদের সমিতির আছে বেশ কয়েকটি পুকুর। কয়েকটি গ্রামে ছড়ানো। সবগুলো পুকুরের একটা করে নাম দিয়েছে আবু তালিব। এখন সে যে পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতী তার সবচেয়ে প্রিয় পুকুর। আবু তালিবের মাঝে মাঝে মনে হয় এই পুকুরের কোনো রহস্য আছে। সব পুকুরেরই সমান যত্ন নেয় তারা। কিন্তু ফিরিয়ে দেয়ার সময় এই পুকুর ফিরিয়ে দেয় সবচেয়ে বেশি। চম্পাবতীর দিকে তাকিয়ে আবু তালিব বুঝতে পারছিল। এ বছরও সে রকমই ঘটবে। যখন তোলা হবে, মাছে মাছে সয়লাব হয়ে যাবে চারপাশ।

চম্পাবতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখে মৃদু হাসি ফুটল আবু তালিবের। হাসিটা হয়তো বড় হত, কিন্তু তার আগে পেছনে সে প্রথমে একজনের হেঁটে আসার ও পরে কাশির শব্দ শুনল। তার সঙ্গে যাদের নিয়মিত উঠাবসা, তাদের সবার হাঁটার শব্দও তার চেনা। কিন্তু এই শব্দ তাদের কারো সঙ্গে যাচ্ছে না, অর্থাৎ তেমন পরিচিত কেউ না। আবু তালিব মুখ ফেরাল এবং অবাক হয়ে দেখল জামিউর হাসান তার একদম কাছে চলে এসেছে। এটা কোনো ব্যাপার না, ব্যাপার হচ্ছে- জামিউর হাসান কেন তার কাছে এসেছে। জামিউর এ এলাকার বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সেই জামিউর কেন এসেছে তার কাছে এটাও অবশ্য আন্দাজ করে নেয়া যায়। আর আবু তালিবের ওতেই অস্বস্তি। এ সময়ে ওসব কথা বলতে তার একটুও ভালো লাগবে না।

জামিউর হাসানের সঙ্গে আবু তালিবের পরিচয় আনুষ্ঠানিক। দেখাই হয় না। কারণ আবু তালিবের নিজস্ব গন্ডির বাইরে তেমন যাতায়াত নেই, আর জামিউর হাসানেরও নিজস্ব গন্ডি আছে, সেটা একেবারেই আলাদা। শুধু ভোটের সময় জামিউর গন্ডির বাইরে লাফিয়ে পড়ে সবার আপন হয়ে যায়।

আবু তালিব জামিউরকে দেখে অবাক হল, তবে সেটা সে বুঝতে দিল না। সে চোখ ফিরিয়ে নিল, যেন জামিউরের এই আসা নিয়ে সে অবাক নয়, কিংবা এটা তার কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। জামিউরও তার পাশে এসে স্বাভাবিক মুখে দাঁড়াল। মাছ ভরতি চম্পাবতীর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল- ক্যাঙ্কা আছেন তালিব মিয়া?

আবু তালিব সামান্য মাথা ঝাঁকাল, অর্থাৎ- আছে।

জামিউর হাসান চুপ করে থাকল। এদিক ওদিক তাকাল, হাই তুলল কিন্তু কিছু বলল না।

হামাক কিছু কবার অ্যাসিছেন?

জামিউর মাথা ঝাঁকাল, হ্যাঁ, সে কিছু বলতে এসেছে।

কন।

আসছি যখন, কমু।

কন।

ঘুরায়া কমু, না সরাসরি ডাইরেক্ট কমু, এইটা ভাবিছি।

সরাসরিই কন।

পুরস্কার নাকি লিবেন না বলা ঠিক করিসেন?

জি, ঠিকই শুনিসেন।

জামিউর হাসান আবার হাই তুলল- লিবেন না কিসক?

আবু তালিব মৃদু গলায় বলল- লিমু না।

কিসক লিবেন না, এইটা বুঝিছি না।... এইটা হামাকের সবার সম্মান।

আবু তালিব চুপ করে থাকল।

হামাকের সবার সম্মান আপনি ফেরত দিবার পারেন না।

হামি তো ফেরত দিচ্ছি না, হামি লিচ্ছিই না।

জামিউর এবার আড়মোড়া ভাঙল- কতা এইবার আরো ডাইরেক্ট করিচ্ছি।

আবু তালিব তাকিয়ে আছে চম্পাবতীর দিকে। তার মুখে সামান্য হাসি দেখা গেল।

আপনি হামাকেরি অসম্মান করবেন, এইটা আপনে বুঝব্যান।

আবু তালিব সামান্য মাথা ঝাঁকাল। এই লোকটা এরপর কী বলবে, সেটা তার জানা আছে।

জামিউর বলল- কিন্তু আপনি হামাকের সরকারক অপমান করবেন, এইটা আপনার ব্যাপার না, এইটা হামাকের ব্যাপার।

হামি পুরস্কার না নিলেই সরকারর অপমান হবি?

হবি। হবি- এই কতা জানাবার জন্য হামি আসছি। আপনি হামার এলাকার মানুষ হয়্যা হামার সরকারক অপমান করবেন আর হামি সেটা চায়া চায়া দেখব, এইটা হবার লয়।

হামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হামার পুরস্কার লিবার লাগবি?

লাগবি। সরকার যখন দিচ্ছে, তখন লাগবিই।

হামাক লিতেই হবি, এমন কতা লিচ্চয় নাই।

কিসক লিবেন না? কে আপনাকে উস্কানি দিচ্ছে?

কেউ দেয় নাই। হামি নিজেই ঠিক করিসি।

এক পত্রিকায় দেখনু কীসব লিখিসে। আপনেও কীসব কসেন।

হামি শুধু কসি এই পুরস্কার লিমু না। আর কিছু হামি কই নাই। আর যা লিখিসে বানায়া বানায়া লিখিসে।

অ, আপনে কন নাই, আর বানায়া বানায়া ল্যাখা দিল!

আবু তালিব চুপ করে থাকল।

আপনি কি ঐ পত্রিকার মালিকের রাজনীতি করেন?

হামি রাজনীতির মধ্যত নাই।

তালে শুধু ঐ পত্রিকার সাথত কতা কসেন ক্যান?

আর কেউ তো হামার কাছত আসে নাই।

আসবি কিসক! পুরস্কার লিবেন না, এই বাজে খবর ওরা কিসক ছাপবি?

হামি অতসব কবার পারমু না।

কিসক পারবেন না। পারবেন তালিব মিয়া...।

জি, কন!

জামিউর হাসানের কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল মাছ ভরতি পুকুরের দিকে। ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, সে বলল- এবার দেখি মাছ খুবই তপড়াচ্ছে!

জি।

ডাঙ্গায় তুলবার পর নয়ন জুড়ায়া যাবি।

জি।

আপনার তখন কী যে ভালো লাগবি!

আবু তালিব জামিউর হাসানের দিকে তাকাল। জামিউর হঠাৎ আসল প্রসঙ্গ ছেড়ে মাছের প্রসঙ্গে চলে এল কেন? মাছ, পুকুর ফসল এসব নিয়ে তার কোনো উৎসাহ আছে বলে সে কখনো টের পায়নি।

জামিউর আবু তালিবের দিকে তাকিয়ে হাসল- কিন্তু একখান ঘটনা যদি ঘট্যা যায়, সব আনন্দ লসটো।

আবু তালিব জামিউর রহমানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গ্রামত খারাপ মানুষের অভাব নাই। বদ মানুষ, ফাজিল মানুষ। তালিব মিয়া, ধরেন,

মাছ ভরতি এই পুকুরত কেউ বিষ ঢ্যালা দিল।

কী কচ্ছেন?

একটা মাছও বাঁচবি কন? সব মরা ভাস্যা উঠবি।

আবু তালিব তাকিয়েই থাকল।

তারপর ধরেন, বদ মানুষের দল অন্য পুকুরেও বিষ ঢ্যাললো।

এসব কি কচ্ছেন?

খারাপ মানুষের কতা কচ্ছি তালিব মিয়া, খারাপ মানুষের কতা কচ্ছি। আপনার ফসলের ক্ষেতত, সমবায়ের অফিসত আগুন দিয়া দিল। কন আপনি, এই রকম খারাপ মানুষ নাই? কন?

'আপনি হামাক হুমকি দিতিছেন?'

ধরো, এইভাবে আমি গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। একদল আন্তরিকভাবে চাচ্ছে আবু তালিব পুরস্কারটা নিক। আরেকদল চাচ্ছে- সে যেন বাধ্য হয় পুরস্কারটা নিতে?

কেন তারা তাকে বাধ্য করতে চাচ্ছে?

এটা খুব সহজ হিসাব। যারা প্রশাসনের লোক, যারা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা যারা সরকারি দল করে তারা চাইবেই আব তালিব এই পুরস্কার নিক। এটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। কেউ যদি সেটা গ্রহণে অসম্মতি জানায়, সরকার স্থানীয় প্রশাসন, তাদের দলের স্থানীয় শাখার কাছে জানতে চাইবে, কেন সে এল না পুরস্কার নিতে। সরকারের স্বীকৃতি গ্রহণ না করার অর্থ সরকারকে অবজ্ঞা করা অপমান করা অস্বীকার করা- এসবই হতে পারে। সুতরাং স্থানীয় প্রশাসনও দলের স্থানীয় শাখার প্রধান কাজ এ ক্ষেত্রে হচ্ছে আবু তালিবকে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত করা।

আবু তালিব আর জামিউর হাসানের কথা শুনে মনে হল মাঝখানে আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে?

হ্যাঁ, তা ঘটেছে। আমি ধারাবাহিকভাবে কিছু বলছি না। এই যে আমি বর্ণনা দিলাম। এটা ঐ পর্যায়ের অংশ বিশেষ মাত্র। হয়তো এর আগে নিচু পর্যায়ের কেউ এসেছে আবু তালিবের কাছে। কিংবা উঁচু পর্যায়ের কেউ। হয়তো জেলা প্রশাসক নিজেই এল কিংবা তার অফিসের উচ্চপদস্থ কেউ। প্রথমে বোঝাল, এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা জানাল। তারপর হয়তো প্রচ্ছন্ন হুমকি দিল। সরকারি স্বীকৃতি কেউ অস্বীকার করার মতো বোকামি কেন করবে- আবার এ রকম কথাও হয়তো বলল। অর্থাৎ চাপটা আবু তালিবের ওপর নানাভাবে, নানা ক্ষেত্র থেকে থাকলই।

কী দেখাবেন আপনি? এতে কি আবু তালিব ভয় পেল। মানে যখন হুমকি আসতে আরম্ভ করল?

দেখো, যদি এমন হত, আবু তালিব ভয় পেল না- এ রকম দেখাতে পারতাম আমি, তবে খুশি হতাম। কিন্তু এ গল্পের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না। আমি প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছি কী হবে গল্পটা। আমি তোমাকে বলেছি এটা এক মুক্তিযোদ্ধার পরাজয়ের গল্প।

আমি একটু প্রসঙ্গ বদলাতে চাই। আমরা

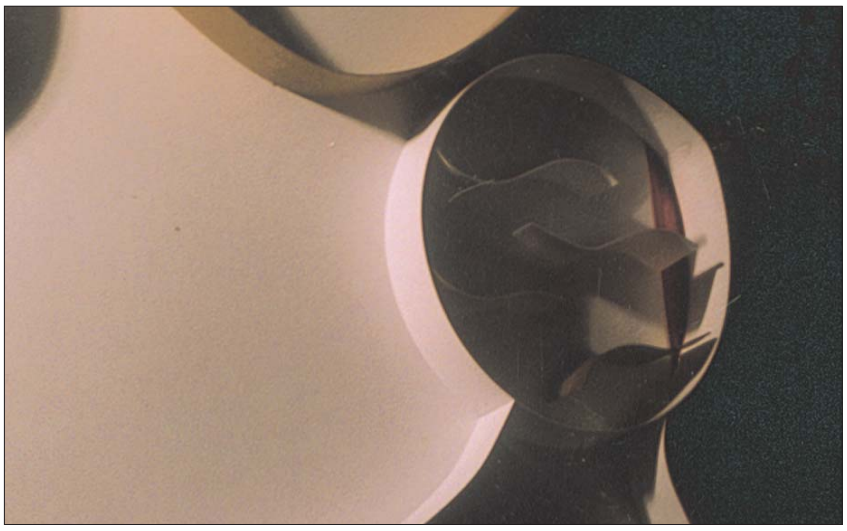

আপনার গল্প নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমেই বলেছিলাম- প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়েও কথা বলব আমরা। একটা ব্যাপার আপনার আগের কিছু, বেশ কিছু গল্পে আমরা দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের, মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজয়ের গল্প। আপনার কি মনে হয় না এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আরো হতাশা তৈরি হয়। এটা কি আপনার নেতিবাচক মনোভাব? আপনি কি মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের জয় নিয়ে গল্প লিখতে পারেন না?

'প্রথমেই বলি- গল্প উপন্যাস কবিতা এসব পড়ে না। অন্তত আমার লেখা তারা পড়ে না। সমাজের যে অংশটি এসব পড়ে তারা শিল্প রুচি বা বোধের যে পর্যায়ে অবস্থান করে, তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা কম। বরং তারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছুটা সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেই বলে আমি মনে করি।

প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে আমি যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধার খারাপ বা পরাজয়ের দিকটা তুলে ধরি, তাতেই আমি দোষী হব কেন? মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধার জয় দেখলেই কি অবস্থা বদলে যাবে? সেটা তো হবে মিথ্যাচার। তাতে মানুষ আরো বিভ্রান্ত হবে। লেখক হিসাবে আমি কি পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারি? আরেকটা ব্যাপার- স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের জয় এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা যে ঘটছে না, আমি সেটাই তুলে ধরছি মাত্র।

আমরা বরং আবার আবু তালিবের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমরা দেখছি, মানে আপনার মুখে শুনলাম- আবু তালিব বিভিন্ন মহলের হুমকিতে ভয় পাবে।

হ্যাঁ, ভয় পাবে। আবারও বলছি- সে ভয় পাচ্ছে না, এ রকম দেখাতে পারলে আমি খুশি হতাম। কারণ সে যথার্থই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। এমন কী স্বাধীন দেশে নানা অসঙ্গতি, বঞ্চনা ও স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থানের পরও, যোদ্ধার চরিত্রটি আবু তালিবের ভেতর থেকে চলে যায়নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ অতি অল্পশিক্ষিত এই মানুষটি তার দারিদ্রকে প্রবলভাবে পরাজিত করতে পেরেছে। আমি মুক্তিযোদ্ধা আমি মুক্তিযোদ্ধা- এই চিৎকার বা এই গল্পটি সে কখনো করেনি। তবে সে যে যোদ্ধা, তার প্রমাণ রেখেছে। তাকে আমরা সফল মানুষ হিসাবেই দেখি। সাফল্য শুধু সে নিজের জন্য অর্জন করেনি। সাফল্য সে আরো অনেককে সমবেত করে অর্জন ও সবার মধ্যে তা বন্টন করেছে। এই মানুষটার পরাজয়, তুমি কি মনে করো, লেখক হিসাবে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে না? কিন্তু আমি যে গল্প ঘুরিয়ে নিয়ে যাব অন্যদিকে, সে সুযোগ আমার নেই।

তারপর কী হল তার, সে নতি স্বীকার করল?

নানা কিছু ভাবল সে। সে ভাবল অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভরতি হবে।

এ বুদ্ধিটা খারাপ না।

সে ভাবল বাড়ি ছেড়ে সাময়িক পালাবে সে। কাউকেই জানাবে না সে, এমন কি নিজের পরিবারের কাউকেও না। কারণ সে নিজেও পালাবে ঠিকই, কিন্তু কোথায় পালাবে, এটা জানে না। এটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার না। কারণ পালাতে চাইলে সে দূরের কোনো শহরে গিয়ে কয়েকটা দিন থেকেই আসতে পারে। আসল ব্যাপার হচ্ছে- উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য সে নানা কিছু ভাবছিল। একজন ডুবন্ত মানুষ খরকুটোও আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু আবু তালিব নিশ্চয় কিছুতেই বাঁচতে পারল না। কারণ তা হলে তো আপনার গল্পই থাকছে না।

হ্যাঁ, আবু তালিবকে বাঁচিয়ে দিলে আমার গল্পই থাকছে না। তার জন্য যে পথ নির্ধারিত হয়ে আছে, সে পথেই তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তার বাড়ির অবস্থা কী? বাড়ির লোকজন তাকে, কিংবা সে বাড়ির লোকজনকে কী বলছে?

তার বাড়িতে লোকের সংখ্যা, আবু

তালিবসহ ৫। সে, তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি। এই নাতিটি আবু তালিবের এবং আবু তালিব এই নাতিটির বড়ই ন্যাওটা। সে এখনো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাকে অধিকাংশ সময় কোলেই রাখতে হয়। এবং যতক্ষণ আবু তালিব বাসায় থাকে, নাতি তার কোলেই থাকে। আবু তালিব মাঝে মাঝে হাসি মুখে বলে- এইটা আমার আব্বাজান ফিরা অ্যাসিছে। এই আব্বাজানরে বেশি না আমার ফসলের জমিন, কোনটারে বেশি ভালোবাসি- এইটা আমি বুঝবার পারি না। যাই হোক, আমরা দেখব আবু তালিব তার সমস্যা নিয়ে নাতির সঙ্গেই কথা বলছে।

কিন্তু নাতি খুবই ছোট...।

খুবই ছোট। কিন্তু সে জন্য কথা বলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ নাতি কথা বলছে না, সে কথা বলতে পারে না, কথা বলছে আবু তালিব- কও তো আমার আব্বাজান এই পুরস্কার আমি ক্যাঙ্কা কর‍্যা লিমু? লিমু না বয়্যা দিচ্ছি। তাইলে পুরস্কার তারা অন্য লোকক দিক, ঝামেলা শ্যাষ।

আবু তালিব অবশ্য তার স্ত্রী এবং পুত্রের সঙ্গেও কথা বলে। পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদে তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। তারপর তারা যখন জানল এই পুরস্কার গ্রহণে আবু তালিব রাজি নয়, তখন তারা অবাক হল। তবে তারা তার কাছে কিছু জানতে চাইল না। কারণ আবু তালিবকে এতদিন ধরে তারা খুব কাছ থেকে দেখে আসছে। তারা ভালো করে জানে সে কারণ ছাড়া কিছুই করে না। এই কারণটা জানার জন্য তারা খুবই উৎসুক। শুধু তারা যে উৎসুক, তা তো নয়, উৎসুক আরো অনেকেই। তারাও আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না। তারা এসে জিজ্ঞেস করছে তার স্ত্রী ও পুত্রকে, পুত্রবধূকেও। কিন্তু তাদের কাছে কোনো উত্তর নেই। এই নিয়ে তারা বেশ কিছুটা লজ্জার মধ্যেও আছে- ঘরের লোক হয়ে তারা কিছুই বলতে পারছে না। তবে জিজ্ঞেস করার সাহস তাদের নেই। ঠিক সাহসের ব্যাপারও বোধহয় এটা না। তারা আবু তালিবের মনমানসিকতা, মর্জি মেজাজ সম্পর্কে জানে। তারা জানে, বললে আবু তালিব নিজেই বলবে। তাকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানা যাবে না।

আবু তালিব কি সবসময়ই এ রকম একরোখা?

ঠিক, তা নয়। এক অর্থে সে একরোখা। ইতিবাচক অর্থে। তা না হলে এমন বিশাল ও সফল সমবায় সমিতির বিস্তার সে ঘটাতে পারতো না। আবার একবার সে এক উদ্যমী কর্মীকে তার সংগঠন থেকে বের করে দিল। সবাই অবাক, জালাল খুবই পরিশ্রমী ছেলে, আন্তরিকও, তাকে কেন সমিতি থেকে বের করে দেয়া হল। এ কথা তার কাছে অনেকেই জানতে চাইল। বাড়ির লোকরাও। আবু তালিব কাউকে কিছুই বলল না। তার ভাবটা এরকম- বের করে দিয়েছি বের করে দিয়েছি, এটার কারণ আবার জানতে হবে কেন! কারণ নিশ্চয় আছে, এটা বুঝতে হবে সবাইকে। তবে কারণ নির্দিষ্ট করে না জানলে কারো কারো মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। তারা ভাবতে পারে বিনা কিংবা ব্যক্তিগত কারণে এমনটা ঘটাল আবু তালিব। সুতরাং ঐ ঘটনায় শেষ পর্যন্ত তাকে মুখ খুলতে হল। সে জানাল, জালাল খুব বড় ধরনের চোর। তার এই বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট প্রমাণও সে তুলে ধরল।

তা, আবু তালিব হচ্ছে এ ধরনের একরোখা। সুতরাং বাসার কেউ তাকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করল না। তবে বাসায় চাপা একটা পরিবেশ তৈরি হল। তার পরিবারের সদস্যরাও অস্বস্তিতে ভুগতে আরম্ভ করল। তারা মনে করল এটা তাদের জন্য জানা খুবই জরুরি। এতবড় একটা স্বীকৃতি আবু তালিব কেন নেবে না! তারপর অবস্থা বদলাতে লাগল। যতই দিন গড়াতে লাগল ততই হুমকির পরিমাণ বাড়তে লাগল। বাড়ির বাইরে যেসব হুমকির মুখোমুখি হল আবু তালিব, সেসব বাড়ির লোকজনের কানে এসে পৌঁছাল। এখানেই ব্যাপারটা থেমে থাকল না। এরপর হুমকি এল অন্যভাবে। আবু তালিবের বাসায় এসে লোকজন হুমকি দিয়ে গেল। প্রশাসন জানিয়ে দিল এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে তার জন্য তারা দায়ী থাকবে না। এমন হুমকিও এল আবু তালিব 'নেই' হয়ে যেতে পারে। আবু তালিবের স্ত্রী এই প্রচন্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে একদিন জানতে চাইল- কী এমন সমস্যা, কী এমন অসুবিধা যদি আবু তালিব এই পুরস্কারটা নেয়। এটা তো একটা সম্মানের ব্যাপার, নাকি?

আবু তালিব স্ত্রীর দিকে কতক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল- 'হামি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। পাক বাহিনী আর যারা এই দ্যাশ চায় নাই, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিসি। লয়?

মানে? দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে বলে আবু তালিবের এই পুরস্কার নিতে কেন অসুবিধা?

শোনো, আবু তালিব কিন্তু পুরস্কার নিতে গেল। হুমকি যখন চরমে উঠল। তার নাতিকে নিয়েও যখন হুমকি দিল, এবং তার এক মাছভর্তি পুকুরে বিষ ছেড়ে দিল, মাছগুলো সব মরে ভেসে উঠল, আবু তালিব তখন দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে রেখে জানাল, ঠিক আছে, তা হলে পুরস্কার নিতে তার হয়ে তার সমিতির কেউ যাক। তাকে বলা হল- সেটা সম্ভব না। কেন সম্ভব না, আবু তালিব বলল, একই তো ব্যাপার। তাকে বলা হল- এটা একই ব্যাপার না। পুরস্কার সমিতি পায়নি, সে পেয়েছে, সুতরাং তাকেই যেতে হবে। আবু তালিব নিজেই যাবে বলে মনস্থ করল।

তার আর কোনো উপায় নেই?

আমরা দেখতে পাচ্ছি তার আর কোনো উপায় নেই। তার ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে, তার মৎস্য খামার ধ্বংস হয়ে যাবে, তার সমবায় সমিতির অফিস আগুনে পুড়বে, তার আদরের নাতি অঘটনের শিকার হবে- এর চেয়ে পরাজয় স্বীকার করে নেয়াই কি ভালো না?

অবস্থা তখন ওরকমই দাঁড়িয়েছিল?

যতটা বলছি হয়তো তারচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছিল সে। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় ধরে যা যা সে গড়ে তুলেছিল, তার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে, এটা সে কী করে মেনে নেয়? তাছাড়া অতসব কিছুর সঙ্গে সে তো একা জড়িত নয়, আরো অসংখ্য মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে ওখানে। তাদের সে সর্বস্বান্ত করতে পারে না। সুতরাং নিজেকে পরাজিত করা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকল না।

এই যে সে অন্যের ক্ষতি হতে না দিয়ে পরাজয় গ্রহণ করল, এটা নিশ্চয় তার মহত্ত্ব হিসেবে আমরা নেব।

উচিত। মহৎই সে। কিন্তু এখানে তার কষ্টটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আমি মুখে বলে যাচ্ছি, সুতরাং ব্যাপারটা তেমন পোক্তভাবে দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু যখন গল্প হিসাবে লিখব, তখন নিরাসক্তির সঙ্গে হলেও তার কষ্টটা আমি তুলে ধরব।

আমরা দেখলাম আবু তালিব পুরস্কার নিতে গেল। অর্থাৎ গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা নিশ্চয় পৌঁছে গেছি।

হ্যাঁ, গল্প প্রায় শেষই।

তা হলে এখন নিশ্চয় বলতে পারেন কেন আবু তালিব পুরস্কার নিতে রাজি হচ্ছিল না।

এখন বলাই যায়। যদিও কোনোদিন চিৎকার করে জানান দেয়নি আবু তালিব, তবে সে তো একজন মুক্তিযোদ্ধাই। এটা সে কোনোদিন, কখনো ভোলেনি। আর সে কারণেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি গ্রহণেও সে অসম্মত হয়েছিল।

আরেকটু খোলাসা করে কি বলবেন?

আবু তালিব জানতে পেরেছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে এক রাজাকার। কী পরিহাস, '৭১-এ পাক বাহিনীর সক্রিয় দোসর সে রাজাকার এখন মন্ত্রী। এবং আবু তালিবকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার তার হাত থেকেই নিতে হবে। একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার জন্য এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কী?

হুঁ। ... পুরস্কার সে নিল...।

নিল। আনুষ্ঠানিকভাবে তার পরাজয় ঘটল। প্রায় কেউই বুঝল না ভেতরে কতটা ক্ষরণ হল আবু তালিবের।

গল্প কি এখানেই শেষ?

শেষ। আবার শেষ না-ও। পুরস্কার নেবে আবু তালিব। পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হবে। সে ক্রেস্ট, সম্মাননা এবং নগদ অর্থ নিয়ে ফিরে আসবে। তবে ফিরে আসার সময় আরও একটা জিনিস তার সঙ্গে থাকবে। সেটা একটা জিজ্ঞাসা। সে ভেবে ভেবে অস্থির হবে, ম্রিয়মাণ হবে আর অনবরত জানতে চাইবে- কে, কে তাকে মুক্তিযোদ্ধা থাকতে দিল না? ... এই হচ্ছে গল্প, বুঝেছ? এখন এটা আমি কতটা গুছিয়ে লিখতে পারব, সেটাই হচ্ছে ব্যাপার।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**